83

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সাক্ষরতা তুমি কত দূরে

সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া

বিশ্ব সমাজের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশেও আমরা প্রতি বছর নানা ধরনের আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে থাকি। কিন্তু সবগুলোর গুরুত্ব এক রকম নয়। 'নামিবিয়া' দিবসে সুধী জনদের কেউ যদি বলে বসেন সুদূর আফ্রিকার একটি দেশের সমস্যা নিয়ে আমরা আর কত মাথা ঘামাতে পারি তবে বিস্মিত হলে মৃদু আপত্তি তোলা ছাড়া কিছু করার থাকে না। অন্যান্য বছরের মত এবারও '৮ই সেপ্টেম্বর '৯২' আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের স্বাক্ষর নিয়ে আসছে এবং চলে যাবে। এর ওপর অনেক আলোচনা সভা হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু এবার কেন যে আমরা দিনটির জন্য যথারীতি নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারছি না।

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি মূল সমস্যা। দরিদ্র জনগোষ্ঠী আজ নিরক্ষরতার বেড়াজালে আবদ্ধ। দেশের ৭৬% জন নিরক্ষর লোক অন্ধকারে পড়ে আছে। তারা শিক্ষার দাবি নিয়ে জন্মেছে অথচ তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে অসহনীয় জীবন যাপন করছে।

বিগত ১২ (বার) বছরে সাক্ষরতার নামে অনেকে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু তাদের ব্যবহার করা শব্দের বর্ণমালাগুলো যদি বাংলাদেশের ১৪ (চৌদ্দ) বছরের ওপরের বয়সের প্রায় সাড়ে চার কোটি নিরক্ষর লোকদের মধ্যে সার্থকভাবে বিতরণ করে দেয়া যেত তবে দেশে বয়স্ক নিরক্ষর বলে কেউ থাকতো না। ১৯৮০ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে উক্ত কর্মসূচী বন্ধ করে দেয়া হয়।

সাক্ষরতা কর্মসূচীর পটুভূমি ঃ

নিরক্ষরতা উন্নতির অন্তরায় নিরক্ষরতার সাথে দারিদ্র্যের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। সাক্ষরতার অভাবে উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়। নিরক্ষর গোষ্ঠীই অধিকতর স্বাস্থ্যহীনতা পুষ্টির অভাব ও কলুষিত পরিবেশের শিকার হয়। পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। সে উন্নয়নের চাবি-কাঠি শতকরা ৮৫ জন কৃষকের হাতে। তারা গ্রামে বাস করে, যেকোন উন্নয়নের জন্য আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা ও আত্ম-শিক্ষা, আর সেই শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে 'সাক্ষরতা' অর্জন। সাক্ষরতা ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত উৎপাদনক্ষম মানুষ সভ্যতা ও আধুনিকতার প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

নিরক্ষর লোক অজ্ঞানতার কারণে বহু সামাজিক সমস্যার উৎস সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে না; বুঝতে পারে না নিজেদের ভাল মন্দ। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারের কারণে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাত্রা, সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি ও অপচয় রোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক প্রকট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অশিক্ষিত জাতি কোন দিনই নিজের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয় না। তাই নিরক্ষতার সাথে দারিদ্র্যের সম্পর্ক নিকটতম।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ উৎপাদন বৃদ্ধি এক কথায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সার্বজনীন সাক্ষরতা। যেমন, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য কানাডা, জাপান, কোরিয়াসহ সকল উন্নত দেশেই তার সাক্ষী। উন্নত দেশের সব কটিতেই সাক্ষরতার হার একশত ভাগের কাছাকাছি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যারা অনুন্নত বিশ্বের অধিবাসী তাদের সাক্ষরতা এবং শিক্ষাকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এ বছরের (১৯৯২) ঘটনা চক্রকে একটা লক্ষণীয় শুভ সূচনা বলা যেতে পারে যে, বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে মূল সমস্যার ওপরই গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমান সরকার পুনরায় এই কর্মসূচী নতুন আঙ্গিকে চালু করেছে। ৪৯ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয় করে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম' নামে একটি প্রকল্প। সরকারী ঘোষণা মোতাবেক ৬৮টি থানার বাহিরেও সমন্বিত কর্মসূচীর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে। এ প্রসঙ্গে গর্বের সাথে বলতে হয়, বিগত ২৬শে জুন, ১৯৭৯ তারিখে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত স্বনির্ভর কর্মশালায় স্বনির্ভর কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, স্বনির্ভর কাঠামোর ভিত্তিতে একত্রিশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। উক্ত ৩১ দফা কর্মসূচীর মধ্যে গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্য উৎপাদন, খাল-কাটা, বৃক্ষ রোপন ও জনস্বাস্থ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা মানুষ বহু দিন যাবৎ শুনে আসছে। ইতোমধ্যে সরকারের রদবদল ঘটেছে বছর বছর, বেড়েছে স্কুল কলেজ এবং শিক্ষক শিক্ষিকা, খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা, কিন্তু পিছিয়ে থেকেছে সাক্ষরতার হার, আর বৃদ্ধি পেয়েছে স্কুল ত্যাগীর সংখ্যা। আমরা যদি উন্নত দেশের দিকে তাকাই তা হলে দেখা যায় রাশিয়া ১৯ বছরে ২৪.০৩% কিউবা দু'বছরে ১৬% চীন ২৫ বছরে ৫৫% আর আমাদের বাংলাদেশে ১৯৫১-১৯৯১ সালে সাক্ষরতা হার ২১%-২৪% ভাগ এসে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ ৪১ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র ০৩%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক, শিক্ষা খাতে খরচ, ওজন সংখ্যা বাড়লো আনুপাতিক শিক্ষার হার বাড়লো না, ছাত্র সংখ্যা বাড়লো না অথচ স্কুল ত্যাগীর হার বেড়ে গেল। সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছিতে হলে এর কারণটি অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। সব থেকে বড় কথা নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করা হলেও পরবর্তীকালে তাদের জন্য চর্চা বা অনুশীলনের ব্যবস্থা না থাকলে পুনরায় তারা নিরক্ষর হওয়াটা স্বাভাবিক।

বিগত পাঁচ বছরে বয়স্ক শিক্ষা খাতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা সম্পদের অপ্রতুলতা এ যাবৎ শিক্ষা সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়ে আসছে। শিক্ষা খাতে ১৯৭৫ সালে জাতীয় আয়ের ১.৬% অংশ ছিল তা ১৯৮০ সালে কমে ১.৪% এবং ১৯৮৫ সালে তা দাঁড়িয়েছিল ১.২% অংশ। শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে হলে অর্থের যোগান এবং তার সদ্ব্যবহার বাড়াতে হবে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ সালে দিকে তাকালে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪৪%। ১৯৮৫ সালে ব্যানবেইস এর তথ্যানুযায়ী দেশের পাঁচ থেকে নয় বছরের শিশুদের ৬২% ভাগ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং বছর শেষে ৫৩% ভাগ স্কুল ত্যাগ করে এবং ৯% প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে। ঐসব ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ কতটুকু আভাস পাওয়া যায়। দেশে স্কুল উপযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ২ কোটি ৪৭ লাখ আর স্কুলে যাচ্ছে ৯৭ লাখ ৬৫ হাজার বাকি ১ কোটি ৪৯ লাখ ৩৫ হাজার ছেলেমেয়ের স্কুলে পড়ার সুযোগ নাই। বর্তমানে আরও ৩৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরকার। কে গড়ে দেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কে শিক্ষিত ও সাক্ষর করবে ৭/৮ কোটি নিরক্ষরকে। কাজেই সাক্ষরতা আলোচনায় শিশুদের প্রাইমারী শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার কথা আলাদা করে দেখা যায় না। সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং যথাযোগ্য প্রস্তুতি নিয়ে অভিযান শুরু করলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। কিউবা, নিকারাগুয়া অন্যান্য দেশ যেভাবে সাক্ষরতার অভিযান শুরু করেছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে স্কুল ও ক্লাস রুমের স্বল্পতা একটা সমস্যা বটে তবে মসজিদ, মন্দির, বিহার, টোল, গির্জা বাড়ির বৈঠকখানায় ও গণশিক্ষা কার্য সম্পন্ন করা যায়। যে সমস্ত এলাকায় স্থানীয় সরকারের অফিস ১০টায় ঐ সমস্ত অফিসের বারান্দাগুলোকে ভোর বেলায় স্কুলের স্থান হিসেবে ব্যবহার করলে, স্কুল ঘরের চাপ অনেকটা কমে যাবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর গৃহ হতে স্কুলের দূরত্বও অনেকটা কমে যাবে। বিভিন্ন সরকারী দলিলে দেখা গেছে বয়স্ক শিক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প তৈরির অনুমোদন বা চালু করা হয়নি। সঠিক প্রকল্প তৈরি করে অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থ মঞ্জুরাদায় থেকে

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

অর্থ বিমোচন করিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রয়োজন। বয়স্ক শিক্ষার পরিক্রমার মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক পরিবর্তন করতে না পারলে সার্বজনীন সাক্ষরতার আশা করা যায়না।

সাক্ষরতার সাথে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক ঃ

শিক্ষার সাথে উপার্জন, জন্ম শাসন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসবগুলোর সফল আসবে যদি সিস্টেম এ্যাপ্রোচে সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া যায়। উপযুক্ত আয় বৃদ্ধি ব্যতীত কোন পরিবারে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা অসম্ভব। অপর পক্ষে আয় বৃদ্ধির জন্য চাই শিক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ে কুশলতা অর্জন। এগুলো হলো মৌলিক সংযোগ।

বিশ্বব্যাংকের 'পভার্টি এন্ড হিউম্যান ডেভোলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকাশনীতে (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৮০) পরস্পারিক সম্পর্কগুলো একটা সহজ এবং বোধগম্য চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ও সমন্বিত উন্নয়নের প্রক্রিয়ার দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। পরিবার পরিকল্পনার সাথে পুষ্টি ও টিকা দান কর্মসূচী যুক্ত করা হচ্ছে। বিশেষ এলাকাসমূহে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী চালিয়ে দেখা গেছে, ঐসব এলাকায় পদ্ধতি গ্রহণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের হার অন্যান্য এলাকায় চেয়ে অনেক ভাল। নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ও একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

বেসরকারী সহযোগিতা ঃ

শোনা যায় বাংলাদেশে সাড়ে চার হাজারেরও বেশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নানারকম উন্নয়ন কাজে লিপ্ত আছেন। যার উদ্দেশ, প্রক্রিয়া ও কার্যকারিতা এক রকম নয়। এদের মধ্যে প্রধান যে কয়টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গণশিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত আছেন এবং উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন কিছুকাল আগে তাদের একটা বিস্তারিত জরিপ শিক্ষা মন্ত্রণালয় করেছিলেন। এদের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার ক্ষমতা এবং সৃজনধর্মী সকল কার্যকলাপের জন্য ফিডার স্কুল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও খামার বহির্ভূত বিভিন্ন উপার্জনমুখী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচীতে এই সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সাহায্য নেয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। বেসরকারী পর্যায়ে এদের অনেকে এমন সব কাজ করতে পারেন যা সরকারীভাবে সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় নয়। আবার এদের এমন কিছু কিছু কাজ আছে বা অনুকরণ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। যেমন, একটি সংস্থার দুস্থদের ঋণ প্রদানের শর্ত হলো সক্ষম দম্পতি হলে কোন না কোন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে; ঋণ নিতে হলে প্রথম বারে অবশ্যই টিপযুক্ত হতে হবে, দ্বিতীয়বার ঋণের জন্য বাংলা বর্ণমালা ও সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এবং তৃতীয় বার (৩০০০/-) তিন হাজার টাকার উর্ধ্বে ঋণ নিতে হলে সহজ লেখা পড়া জানতে হবে। এই ধরনের নীতি সহজেই কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বিআরডিবি প্রভৃতি প্রকল্পে সহজে সংযোজিত করা সম্ভব। তবে বেসরকারী সংস্থাগুলো সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারেন গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটি প্রতিষ্ঠা করা; মহিলা, যুবক, ভূমিহীন, কৃষক ও বিভিন্ন পেশার মানুষের জন্য শ্রেণী ভিত্তিক সংগঠন করা, গ্রাম ভিত্তিক জরিপ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করানো, যার মধ্যে শিক্ষা, সাক্ষরতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলীর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ ও থানা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা।

সরকারি প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীয় করা ও স্থানীয় সরকারকে জোরদার করার যে, কল্যাণমুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে জনসাধারণকে নিরক্ষরতা অভিযানে সম্পৃক্ত করতে। এই প্রক্রিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের ভূমিকা প্রধানত সাহায্যকারী ও তদারকির কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে স্থানীয় জনগণকে মুখ্য ভূমিকা পালনের দায়িত্ব প্রদান করলে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাবে। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রাইমারী স্কুলগুলোকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সংখ্যক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে যা স্থানীয় সুবিধানুযায়ী নির্দিষ্ট স্কুলেই হতে পারে বা স্কুলের আওতায় এলাকার অন্যত্রও হতে পারে, যেখানে ফিডার স্কুল, সাইট স্কুল ও অন্যান্য ধরনের শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা সম্ভব। গ্রামে অবশ্যই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য একটি সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কমিটি থাকতে হবে যা গ্রামবাসীরাই প্রতিষ্ঠা করবে। তবে এর চেয়ারম্যান হবেন ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য অথবা সকলের মনোনীত ব্যক্তি। উক্ত কমিটির মধ্যে থাকবে একটি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো গ্রামোন্নয়নের কমিটি তদারকি করবে নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। থানা শিক্ষা অফিসার ইউনিয়ন ও গ্রামভিত্তিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটিসমূহ পরিদর্শন ও তদারকি করবেন।

উদ্বুদ্ধকরণ সংগঠন সৃষ্টি সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনায় সহায়তা করতে পারে এমন উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে যথাসম্ভব ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের সাক্ষরতা সম্পার্কিত কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের গবেষণা, মূল্যায়ন তদারকি ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজের জন্য বিভিন্ন পদ সৃষ্টি, বয়স্ক শিক্ষা, একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার জন্য যেমন প্রচার মাধ্যমগুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তেমনি সাক্ষরতা অভিযানের জন্যও রেডিও এবং টেলিভিশনে দৈনিক যথেষ্ট সময় দিতে হবে। তবে প্রোগ্রামগুলো প্রাণবন্ত না হলে বিশেষ সুফল হবে না। তাছাড়া দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলো আবশ্যিকভাবে একটি কলামের জায়গা বিনা খরচে ছেড়ে দিতে হবে, নব্য সাক্ষরদের জন্য বিষয়বস্তু ছাপাতে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে জাতীয় শপথ ও নেতৃত্ব ঃ

অনেক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কিন্তু সে অনুপাতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে ব্যাপক কর্মসূচী হতে নেয়া হয়নি। জাতীয়ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের যে ঐকান্তিক এবং আন্তরিক ইচ্ছা আছে তাকে একটি রাজনৈতিক সংকল্পে রূপ দিতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুযোগ্য সচিব ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আবেদন জানাবো, 'নিরক্ষরতা জাতির প্রধান অভিশাপ' এই শ্লোগানটি গ্রহণ করে সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ নেতৃত্ব প্রদান করুন।

আমাদের দেশের তিন চতুর্থাংশ অধিবাসী নিরক্ষর এটা শুধু জাতির জন্য গ্লানিই নয়, এদের অবস্থার উন্নতি করার সকল প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে শুধু নিরক্ষরতার অভিশাপের জন্য। ক্ষীণ প্রচেষ্টা দিয়ে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এর জন্য চাই রীতিমত সংগ্রাম। সে সংগ্রামের জন্য নেতার অভাব নেই কিন্তু চাই সুযোগ্য নেতা। জাতি তা আশা করতে পারে কি? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে সেই নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করবেন এবং দেশের নিরক্ষর জনগণের হাতে সার্থকভাবে অন্তত একটা করে বই তুলে দেবেন, হোক সেটা বাল্য শিক্ষা বা নিরক্ষরদের পড়ার মত বই। অন্ধকার থেকে আলোতে যাবার সেতু পার হতে এর কোন বিকল্প নেই। (মতামত লেখকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)

[লেখক স্বনির্ভর বাংলাদেশের গণশিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক]